আব্দুল বায়েস

কালের সাক্ষী রেহমান সোবহান

রেহমান সোবহানের সদ্য প্রকাশিত আত্মজৈবনিক বইয়ের নাম *অশান্ত সময়ের অনুস্মৃতি আলো থেকে অন্ধকার* (ইউপিএল, মার্চ ২০২২)। ৮৭ বছর বয়সে প্রকাশিত হলো তার এ বই। ৮১ বছর বয়সে প্রকাশিত আত্মজীবনীর প্রথম পর্বের শেষ পাতার শেষ লাইনটি ছিল এ রকম : 'আমরা যখন ন'মাস পর বাড়ি ফিরতে পারার আনন্দে একে অপরকে আলিঙ্গন করছিলাম তখন ভাবতেই পারিনি যে নিষ্ঠুর এবং বিভাজিত দিনগুলো সামনে অপেক্ষা করছে।' বস্তুত, সেই নিষ্ঠুর ও বিভাজিত সময় নিয়ে লেখা *অশান্ত সময়ের অনুস্মৃতি আলো থেকে অন্ধকার* (Untranquil Recollections: From Dawn to Darkness: Political Economy of Nation Building in Post-Liberation Bangladesh)।

শুনলাম তৃতীয় পর্ব আসছে নব্বইয়ের আগেই, আর তাই ভাবছি রবীন্দ্রনাথের কথায় 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী/ আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি...।'

এক.

লেখক রেহমান সোবহান জীবনভর ঘটনাবহুল অথচ অশান্ত জীবনের মধ্য দিয়ে গেছেন। তবে এটা ছিল স্বল্পস্থায়ী দ্বিতীয় পর্ব। তিনি বলছেন, 'আমি কল্পনা করতেও পারেনি যে তিন বছর দশ মাসের মধ্যে আমি একই বিমানবন্দর দিয়ে পরবর্তী চার বছরের জন্য স্ব-নির্বাসনের পথ বেছে নেব...এ সময়ে আমাদের স্বপ্নের সদ্য স্বাধীন জাতি সেনানিবাস শাসনে নির্জীব নিপতিত হবে অথচ তার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার পরিবার এবং তার নিকট রাজনৈতিক সহযোদ্ধারা তাদের কবরে নীরবে শায়িত থাকবেন।' তিনি আশা করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত চরম পরিপূর্ণতার পরিপূরক হবে এ সময়টা কিন্তু আশা দিয়ে শুরু হলেও অন্ধকারে তার শেষ হয়।

এ বইতে মূলত তিনি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে ওঠা আশা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন সেগুলো চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। একদিকে গল্পের মতো করে প্রাঞ্জল ভাষায়, হাস্যরসে জানা-অজানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান কিছু বিভ্রান্তি দূর করার প্রয়াসও নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, তখনকার বিদ্যমান বৈরী পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বকে ব্যর্থ হিসেবে ভাবা এক মস্ত বড় ভুল।

দুই.

যদি বলি লেখক তার আত্মজীবনীতে গল্প শুনিয়েছেন তাহলে ১৬টি গল্পের প্রথমটি হচ্ছে 'মুক্ত বাংলাদেশে আমার প্রথম দিনগুলো'। তার কথায় আধো আলোকিত সময় (Twilight phase)। ১৯৭২ সালের এক ঠাণ্ডা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন জানালা দিয়ে আলো এসে যেন সমৃদ্ধি আর স্বপ্নের সংবাদ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে—নয় মাসের উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা শেষে মুক্ত বাংলাদেশে তিনি; বাংলাদেশের একজন সৈনিক হিসেবে পৃথিবী পরিভ্রমণে ভাবতেও পারেননি যে খুব শিগগির তার সফরের শেষ হবে—যেন ওম শান্তি বলে আড়মোড়া ভাঙা।

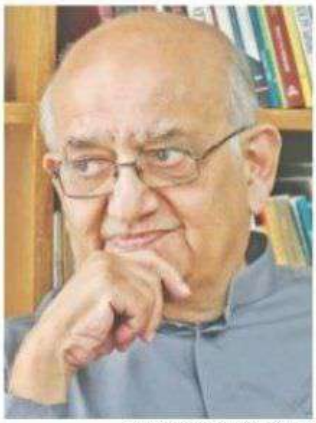

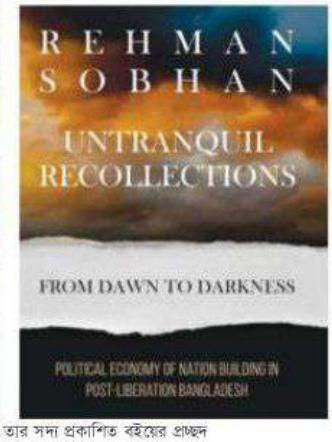

অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও তার সদ্য প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদ

কিন্তু যার বাড়িতে ছিলেন, সেই বন্ধু টুলু তাকে দিলেন অন্য খবর—নতুন বছরের উজ্জ্বল সূর্যালোক নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের আঁধারি দিকটা অস্পষ্ট রাখছে। তখনো বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরেননি, ছয় সদস্যের মন্ত্রিসভা নিয়ে ঢাকায় প্রথম সরকারে সমন্বয়হীনতা এবং যার যার জায়গায় ক্ষমতার খুঁটি পোঁতার প্রচেষ্টা, মুক্তিযোদ্ধা নাম দিয়ে ষোড়শ বাহিনীর বাড়াবাড়ি, গাড়ি-বাড়ি দখল, চার খলিফার রাজত্ব, মুজিব বাহিনীর সশস্ত্র অবস্থান, ভয়ভীতিতে রাতে ঘরের ভেতর মানুষের আটকে থাকা ইত্যাকার বিষয় নিয়ে প্রাণবন্ত বর্ণনা রয়েছে বইতে। পাঠক জানবেন লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিনের চিফ অব স্টাফ হওয়ার একটা প্রস্তাব পেশ হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে কিন্তু যারা বাদ সাধলেন তাদের কেউ কেউ বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন; যেখানে সফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান স্পিকটি নট, সেখানে পদবঞ্চিত খাজা ওয়াসিউদ্দিন খুনি মেজরদের বললেন, তোমাদের কাজের জন্য লজ্জিত থাকা উচিত। এ খবর নিতান্তই নতুন এবং জাতির জন্য দিক নির্ণায়কও বটে (অধ্যায়-২)।

তিন.

একসময় ভাগ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল লেখকের। দেশে ফেরার প্রথম দিন নুরুল ইসলাম ও তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু জনতার প্রবল স্রোতে তাদের আশা খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন ব্যর্থ হয়ে ফেরার সময় বঙ্গবন্ধুর ক্ষণিক দৃষ্টি পড়লে দ্রুত দুজনকে ডেকে জাপটে ধরা। তার দুদিন পর প্রথম সাক্ষাতে একঘা-সেকথার পর বঙ্গবন্ধু নুরুল ইসলামকে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং রেহমান সোবহান ও আনিসুর রহমানকে সদস্য নিয়োগ দিলেন। পরে তাদের পরামর্শে যোগ দিলেন মোশাররফ হোসেন। বলার বোধ হয় অপেক্ষা রাখে না, শুরুতে এ চারজন তীরহারা ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবেন বলে পরিকল্পনা কমিশনের হাল ধরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাদের বলেছিলেন, তিনি একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতি পেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পরিকল্পনা কমিশনের কাজ হচ্ছে এ লক্ষ্য কীভাবে অর্জন করা যায় সে বিষয়ে তাকে উপদেশ দেয়া। তবে পরিকল্পনা কমিশনের সঠিক ভূমিকা নিরূপণের ভার সদস্যদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

দু-একটা অজানা ও বিভ্রান্তিকর বিষয়ের অবতারণা করেছেন লেখক। এক. ভারত ও পাকিস্তানের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহানের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধু তৎকালীন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে ওই দায়িত্ব সমর্পণ করেন। দুই. পরিকল্পনা কমিশন নিয়ে (এবং অন্যান্য বিষয়ে) তাজউদ্দীনের সঙ্গে আলাপ না করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং লেখক বলেছেন, 'ক্রমবর্ধমান এই বিভাজন এবং নিয়তিনির্দিষ্ট পরিণতির চাক্ষুষ সাক্ষী আমরা।' তিন. প্রথম বছর তাজউদ্দীন আহমদের হস্তক্ষেপহীন সভাপতিত্বের সময় (laissez -Faire Chairmanship) প্রত্যাশিত নিয়মিত বৈঠক হতো না বললেই চলে। পরিকল্পনা কমিশন নিজের মতো করেই চলত। সে সময় বাম শিবিরে চাউর থাকা বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীনের সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ ও চিন্তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন—এমন ধারণা তাদের রোমাঞ্চকর কল্পনা বৈ কিছু নয়। কারণ এই এক বছরে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে তার দর্শন বা চিন্তাভাবনা ভাগ করেননি। চার. সচিব নিয়োগ নিয়ে ছিল অন্য এক নাটক। সচিব গোলাম রাব্বানি সহপাঠী এক প্রতিমন্ত্রীর অধীনে কাজ করবেন না; অন্যদিকে পাকিস্তানফেরত আব্দুস সাত্তার খাঁটি আমলামনস্কতা শুরু করলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ২৪ ঘণ্টায় বদলি হন। অবশেষে পাকিস্তান থেকে নিজের ও পরিবারের ঝুঁকি নিয়ে, চোরাকারবারিদের অর্থ দিয়ে কাবুল আর দিল্লি হয়ে পালিয়ে আসা তীক্ষ্ণ মেধাবীসম্পন্ন এম সায়েদুজ্জামান সচিব হওয়ার পর থেকে কমিশন কাজে গতি পায় (অধ্যায় ৩ ও ৪)।

চার.

এমনিভাবে গল্প গড়ায়। পরিকল্পনা কমিশনে আনিসুর রহমান ছিলেন সবচেয়ে আদর্শিক। তবে সামাজিক পরিবর্তন আনায় সরকারের ঢিমেতেতালা পদক্ষেপে সন্দিহান ছিলেন; চেয়েছিলেন সবাই সাইকেলে করে যাতায়াত করুক। ত্যক্তবিরক্ত হয়ে অবশেষে বিদায় নিলেন, তবে Lost moment নাম দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সমীপে পাঠিয়ে দিলেন অনেক নীতিসংক্রান্ত কাগজপত্র। মোশাররফ হোসেন ছিলেন বাস্তববাদী; তিনি ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করতেন না যে শাসক দলের সংস্কারে সায় আছে। নুরুল ইসলাম নন-ইডিওলজিক্যাল, তবে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল। রেহমান সোবহান ছিলেন অচিকিৎস্য আশাবাদী (Incurable optimist), যদিও সময় পেরিয়ে তিনিও একজন হতাশাগ্রস্ত কর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যেভাবেই হোক নৌকা তীরে ভিড়বেই। অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। প্রচুর কাজ করেছেন—পরিকল্পনা কমিশন থেকে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রণালয় ও কেবিনেটে যাওয়া মোট কাজের তিন-চতুর্থাংশ তার আওতায় থাকা দপ্তর থেকে। কিন্তু বুঝলেন, এ দেশে নীতি গ্রহণ হলেও বাস্তবায়ন হয় না; আমলাতন্ত্র উইপোকার মতো কুরে কুরে খায় এবং সবচেয়ে বড় কথা রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। যতটুকু করতে পেরেছেন তা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবে সম্ভবপর হয়েছিল। সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদের অভাব না থাকলেও প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় দ্রুত বাংলা বলায় তার অপারগতা এবং তিনি মনে করেন বাংলা ভাষায় পারদর্শিতার অভাব তার জীবনে কাল হয়েছে (অধ্যায় ১৬)।

পাঁচ.

১৫ আগস্ট ভোর ৬টার দিকে খবর পেলেন তার পূর্বনির্ধারিত ব্যাংকক যাওয়া হবে না এবং শুনলেন মেজর ডালিমের উদ্ধত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে খুন করার খবর। মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ ও এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খোন্দকার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিলে অন্য কিছু ঘটতে পারত। একমাত্র কাদের সিদ্দিকী রুখে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাসবিদদের গবেষণার বিষয় হতে পারে কোন পরিস্থিতিতে বাহিনীর প্রধানরা মোশতাক সরকারকে সমর্থন দিয়েছিল ইত্যাদি মন্তব্য রেখেছেন বইতে। অবাক করার মতো, আওয়ামী লীগ কর্মীদের কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিরোধ আসেনি। যাই হোক, লেখক মনে করেন, যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল, তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল ওই সময়টি বেছে নিতে যখন তার নেতৃত্বে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময় পার হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর রক্তে ভেজা উত্তরাধিকাররা তার অসামান্য পরিশ্রমের ফসল ভোগ করতে পারে (অধ্যায় ১৫ ও ১৬)।

ছয়.

জাতীয়করণ কর্মসূচির পেছনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা কাজ করেনি, বরং অবাঙালি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশ ত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-কারখানা এবং অন্য কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হয়। পরিকল্পনা কমিশন থেকে পাওয়া কিছু শিক্ষা অতিগুরুত্বপূর্ণ; যেমন বাস্তবায়নের ক্ষমতা, তদারকি ইত্যাদি। 'বাকশাল' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। যদিও গণতন্ত্রবিরোধী বলে তার সায় ছিল না; আছে ষড়যন্ত্র ও খলনায়কদের ভূমিকার কথা। অর্থাৎ বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় নিয়ে রচিত হতে পারে একেকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

সাত.

তার বিদেশ সফর আটকে দিয়েছিল মোশতাক সরকার, কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার প্রচারণা প্রেরণা জুগিয়েছিল সারা বিশ্বে। রেহমান সোবহান মুখ্য সচিব মাহবুবুল আলম চাষিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে যে বঙ্গবন্ধুর আমলের সব মন্ত্রী এমনকি মুজাফফর আহমদ চৌধুরীও বিদেশ গেলেন, আমার ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? চাষি উত্তর দিলেন, 'আপনি আওয়ামী লীগের সব মন্ত্রীর চেয়েও শক্তিশালী; ভয়টা ওখানেই।' পরে অবশ্য অনুমতি মিলেছিল এবং স্ব-নির্বাসনে গিয়েছিলেন রেহমান সোবহান; হয়তো চেতনায় ছিল জীবনানন্দ দাশ—'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব কাঁঠাল ছায়ায়।'

আট.

নিবন্ধকারের কথা

বইটির বাংলা তর্জমা আশা করা অবশ্যই অন্যায় নয়, সাধারণ পাঠকের কাছে বইতে বিধৃত ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরা দরকার এবং তা বাংলায় বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া অমর্ত্য সেনের মতে, একদল পাঠক থাকেন, যারা ইংরেজি জানেন কিন্তু বাংলায় পড়তে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন (যেমন তিনি নিজে); বইয়ের শিরোনাম একটু সংক্ষেপ হলে জুতসই হতো; ষোড়শ অধ্যায়টি পরবর্তী সংকলনে অধিকতর প্রাসঙ্গিক হতে পারত।

এই বই পড়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে বর্তমান প্রজন্ম। বাংলাদেশের সেই কালো অধ্যায়টিকে এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস, অর্থনীতি আর রাজনীতির চাদরে আবৃত করার কাজটি অত সহজ ছিল না।

সব শেষে, একটা সফল ও সার্থক আত্মজীবনীর লক্ষণ হচ্ছে এর প্রাসঙ্গিকতা, পড়া শেষে থেকে যাওয়া প্রভাব, সুলিখন, পাঠক ধরে রাখার নিমিত্তে নাটকীয়তা, সত্যতা ইত্যাদি। তাছাড়া দার্শনিক বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেলের জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সূত্র ধরে বলি, এই বই শুধু জ্ঞান দেয় না, পাঠকের বিচক্ষণতা সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখবে এবং এ বিচারে রেহমান সোবহানের বইটি সব শ্রেণীর পাঠকের জন্য সুপারিশ করা বোধ করি যুক্তিসংগত।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়— 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।'

আব্দুল বায়েস: অর্থনীতির অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক